জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক

তুলসীপ্রসাদ বাগচী

‘একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি’—প্রাচীন ভারতবর্ষের এই মহাবাণী আমরা পাই মানবজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্‌বেদে (১। ১৬৪-৪৬)।[১] সেই ঐক্যবিধায়ক মহাবাণী ভারতের পুণ্য মৃত্তিকায় বিভিন্ন যুগাবতার ও ধর্মসংস্থাপকদের দিব্যকণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে যুগে যুগে, কালে কালে। আধুনিক ভারতবর্ষেও এই মহামন্ত্র যুগাবতারের ঐশ্বরিক কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে—‘যত মত তত পথ’। ভারতবর্ষের এই সর্বগ্রহিষ্ণু ও সর্বসহিষ্ণু ঐতিহ্যকে বন্দনা করে সাধককবি কাজি নজরুল লিখেছিলেন :

‘‘উদার ভারত! সকল মানবে
দিয়াছ তোমার কোলে স্থান।
পার্সি-জৈন-বৌদ্ধ-হিন্দু-খ্রিস্টান-শিখ-মুসলমান॥
তুমি পারাবার, তোমাতে আসিয়া
মিলেছে সকল ধর্ম জাতি;
আপনি সহিয়া ত্যাগের বেদনা
সকল দেশেরে করেছ জ্ঞাতি;
নিজেরে নিঃস্ব করিয়া, হয়েছ
বিশ্ব-মানব-পীঠস্থান॥ ’’[২]

একে কবিসুলভ অত্যুক্তি বলে নস্যাৎ করা অবিধেয়, এটি ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ও গৌরবময় ইতিহাসের অভ্রান্ত সাক্ষ্য। পক্ষপাতদুষ্ট ঐতিহাসিকদের ভ্রূকুঞ্চনকে উপেক্ষা করে আমরা সজোরে বলব—উদার ভারতবর্ষের মাটিতে কখনও কোনও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার জন্ম হয়নি। আমাদের দুর্ভাগ্য, পরাধীন ভারতে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার (যাদের ঘোষিত নীতি ছিল ‘Divide and Rule’, যার সরলার্থ ‘ভাগ করে ভোগ করো’) নিজেদের স্বার্থে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ভ্রাতৃবিদ্বেষের এই তীব্র হলাহল আমাদের সমাজদেহে ইঞ্জেকশন করে ঢুকিয়ে গেছে। এই বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের বারবার কঠিন ভাষায় সতর্ক করেছেন।[৩] রাজনৈতিকভাবে এর মোকাবিলা করবার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫)। শ্বেতাঙ্গ শাসকদের এই বিভাজনের চক্রান্তকে ব্যর্থ করবার জন্য তিনি বহু-বিতর্কিত ‘বেঙ্গল প্যাক্ট’-এর (১৯২৩-২৪) পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর শুভ প্রচেষ্টা সেই সময়ে অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা এবং ব্যঙ্গবিদ্রূপের সম্মুখীন হয়েছিল।[৪] কিন্তু এই বিষয়ে তাঁকে সর্বতোভাবে সমর্থন ও সাহায্য করেছিলেন তাঁর সর্বোত্তম রাজনৈতিক শিষ্য তরুণ সুভাষচন্দ্র বসু। এই দুই তীক্ষ্ণধী এবং বাস্তববাদী রাজনৈতিক

নেতা অনেক আগেই বিভেদকামী ব্রিটিশ শাসকদের এই ঘৃণ্য কূটকৌশল বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরা দেশবাসীকে এই বিষয়ে সচেতন করতে সচেষ্ট হন এবং এর মূলোৎপাটন করতে সবরকমভাবে উদ্যোগী হন। দেশবন্ধুর রহস্যময় অকালমৃত্যুর (১৬ জুন ১৯২৫) কারণে এই মহান উদ্যোগেরও অকালমৃত্যু ঘটল। সুভাষচন্দ্রকে ব্রিটিশ সরকার তখন বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করে রেখেছিল সুদূর বর্মায় (তিনি কারারুদ্ধ হয়েছিলেন ২৫ অক্টোবর ১৯২৪)। প্রথমে লালবাজার, সেখান থেকে বহরমপুর জেল, সেখান থেকে সাক্ষাৎ নরকে, অর্থাৎ বর্মার মান্দালয় জেলে তাঁকে আড়াই বছরের বন্দিজীবন কাটাতে হয়েছিল।

পরবর্তী কালে, সুভাষচন্দ্র যখন কারামুক্ত হয়ে (১৬ মে ১৯২৭) দেশে ফিরে এসে ভারতের রাজনীতিতে এবং সেই সঙ্গে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিলেন, তখনও তিনি বারবার এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি (জাতীয় সংহতি) নিয়ে কাজ করে গেছেন। তিনি জানতেন, হীন সাম্প্রদায়িকতা আমাদের জাতীয় ঐক্যকে দুর্বল করবে এবং গোপনে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করেই চলবে। সেই কারণেই ব্রিটিশরা সাম্প্রদায়িকতাকে গোপনে ইন্ধন দিয়ে যেত। সুভাষচন্দ্রের সেই শুভ উদ্যোগ বহুলাংশে সফল হয়েছিল ঠিকই—যার সর্বশেষ উদাহরণ কুখ্যাত হলওয়েল মনুমেন্টের চিরবিলুপ্তি—কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হল না। তৎকালীন কংগ্রেস দলের নানারকম জটিল-কুটিল রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার হয়ে তিনি দেশত্যাগ করতে বাধ্য হলেন (১৬ জানুয়ারি ১৯৪১)। তার দশদিন পর (২৬ জানুয়ারি ১৯৪১) সেই সংবাদটি খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল।[৫]

অবশ্য, দেশত্যাগ করলেও তিনি ব্রতত্যাগ করেননি। দেশের বাইরে গিয়ে তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী গঠন করেছিলেন ইওরোপের মাটিতে। পরে, সামরিক-কৌশলগত কারণে তিনি কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করে ইওরোপ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চলে এলেন। তারপর তাঁর নেতৃত্বাধীন দুর্ধর্ষ 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান করল ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে (যা ভারতবর্ষের তৎকালীন ইতিহাসে তুলনারহিত)। এর ফলে অচিরেই ভেঙে পড়ল প্রবল পরাক্রান্ত (এবং রণক্লান্ত) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মেরুদণ্ড। সেই গৌরবময় ইতিহাস আপাতত আমাদের আলোচ্য নয়। আমরা শুধু জানতে চাইছি, কোন 'উদার বাণী'-র জাদুমন্ত্রে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় বংশোদ্ভূত সকল 'হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃস্টানী'কে এক প্রেমহারে গেঁথে পরাধীন ভারতমাতার 'সিংহাসন-পাশে' নিয়ে আসতে পারলেন? নেতাজী জানতেন, তাঁর সব সামরিক উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি তিনি সবরকম সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে না পারেন। এই কাজে তিনি কীভাবে সফল হলেন? আজকের এই দুঃসময়ে সেই নেতাজী-ম্যাজিকের অনুসন্ধান ও অনুধ্যানের চেষ্টা করা যাক।

দুই

সুভাষচন্দ্রের সমস্ত বহিরঙ্গ কাজের সর্বাধিক প্রকাশ হয়েছিল তাঁর প্রকাশ্য কর্মজীবনের শেষ পর্বে (১৯৪১-১৯৪৫)। এই পর্বেই তাঁর রূপান্তর হল সুভাষচন্দ্র (বা সুভাষবাবু) থেকে সর্বজনমান্য এবং সংক্ষিপ্ততম একটি শব্দে—'নেতাজী'। বার্লিনে গিয়ে সংকীর্ণ ঘরোয়া রাজনীতি ছেড়ে শুরু হল তাঁর বিশ্বরাজনীতির বিস্তৃত অঙ্গনে সদর্প এবং বীরোচিত পদচারণা। একদিকে তিনি জার্মান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ভারত-জার্মানির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য

সাহায্যপ্রাপ্তির চেষ্টা করতে লাগলেন।[৬,৭] অপরদিকে জার্মানি ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে বসবাসকারী নির্বাসিত ভারতীয়দের এবং ভারতীয় ছাত্রদের নিয়ে একটি গোষ্ঠী গড়ে তুলতে চেষ্টা করতে থাকলেন। অবশেষে অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সাংগঠনিক ক্ষমতার জোরে তিনি বার্লিনে 'ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার' স্থাপন করলেন (২ নভেম্বর ১৯৪১)। এটি ছিল তাঁর প্রশাসনিক কাজকর্মের মূল কেন্দ্র। ভারতবর্ষ স্বাধীন হতে আর বেশি দেরি নেই—এটা ধরে নিয়েই তিনি কাজ শুরু করলেন। এই কেন্দ্রের প্রথম দিকের উদ্ভাবনী কাজের কয়েকটি নিদর্শন :

১। জাতীয় সংগীতরূপে রবীন্দ্রনাথের লেখা 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটিকে নির্বাচন করা হয়েছিল।[৮]

২। স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকাও থাকতে হবে। শূন্যে লম্ফ-প্রদানকারী শার্দূলের (ব্রিটিশ-সিংহের ওপরে আক্রমণোদ্যত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের প্রতীক?) চিহ্ন-লাঞ্ছিত ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা নির্বাচিত হয়েছিল এই উদ্দেশ্যে।

৩। ভারতীয়দের পারস্পরিক সম্বোধনের জন্য 'জয় হিন্দ' শব্দদ্বয়কে গ্রহণ করা হল। এত সংক্ষিপ্ত, অর্থবহ ও অসাম্প্রদায়িক সম্বোধন এর আগে কেউ ব্যবহার করতে পেরেছেন কি?

৪। এই সেন্টারেই প্রথম স্থির করা হল যে এরপর থেকে সুভাষচন্দ্রকে 'নেতাজী' বলে সম্ভাষণ করা হবে এবং নিজেদের কথোপকথনের মধ্যেও তাঁকে 'নেতাজী' বলে উল্লেখ করা হবে। অতঃপর, নেতা সুভাষচন্দ্র একমেবাদ্বিতীয়ম্ 'নেতাজী' নামেই বিশ্বপরিচিতি লাভ করলেন।

এই সময়ে অন্যান্য কূটনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে অনুগামীদের মন থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিষ দূর করে দিতেও নেতাজী প্রবলভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শী কর্নেল আবিদ হাসান সাফরানি (১৯১১-১৯৮৪) লিখেছেন :

''সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে নেমেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গোড়া থেকেই। জার্মানীর ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার এবং পরবর্তী কালের ইন্ডিয়ান লিজিয়নেও তাঁর ওই মনোভাব খুবই স্পষ্ট ছিল। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সদস্যদেরও তিনি সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে ওঠার শিক্ষা দিয়েছিলেন সবার আগে। তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, কুসংস্কার এবং সম্প্রদায়ের বন্ধন ছিন্ন করতে না পারলে বড় মাপের মানুষ হওয়া যায় না। আর, বড় মাপের মানুষ মাত্রই বড় শক্তির অধিকারী। একমাত্র এই শক্তিমানদের পক্ষেই বিদেশি শাসকের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করা সম্ভব।

''ব্রিটিশরা ভারতবাসীদের এই দুর্বলতার কথা খুব ভালভাবেই জানত। সুতরাং বিচ্ছিন্নতাকে তারা প্রশ্রয় দিত নানা দিক থেকে। সাম্প্রদায়িকতাকে উদ্দেশ্যসাধনের হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগাত সবসময়। [১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত-ভাগের পেছনেও ব্রিটিশ শাসকদের এই হীন চক্রান্ত সক্রিয় ছিল]...

''দূরদর্শী নেতাজী এই বিষয়টি সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন প্রথম থেকেই। তাঁর মুক্তিবাহিনীকে তিনি জাত বা ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করেননি। যা করেছিলেন সেটা ঠিক এর উলটো। বাহিনীর হিন্দু, মুসলমান, শিখ ইত্যাদি সব ধর্মের মানুষকে তিনি মিশিয়ে দিয়েছিলেন একসঙ্গে। সবাই এক—এই বোধটিই তিনি জাগাতে চেয়েছিলেন সবার মধ্যে। তার মানে এই নয় যে ধর্মহীন জীবনযাপন করতে হবে। ধর্ম একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়। আলাদাভাবে যে কেউ ধর্মাচরণ করতে পারে।

''...[ব্যক্তিগত] ধর্মাচরণে বাধা নেই, ধর্মবিশ্বাসে

আঘাত দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু সবসময় মনে রাখতে হবে—এটি ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব জগৎ। মুক্তিবাহিনীর মূল লক্ষ্যের সঙ্গে এসব গুলিয়ে ফেলা চলবে না কিছুতেই।"[৯]

পরম ধার্মিক নেতাজীর বিষয়ে আবিদ হাসান সাহেবের সশ্রদ্ধ মন্তব্য আমাদের জানা উচিত—

''গর্জন করে উঠলেন নেতাজী। [বললেন], '...শোনো, একটি কথা তোমাকে খুব স্পষ্ট ভাবে বলে দিচ্ছি। আমাদের কাজকর্মের সঙ্গে কিছুতেই ধর্মকে মেশাতে দেব না আমি। আমাদের সবকিছুরই একমাত্র ভিত্তি হল জাতীয়তাবাদ।... যা জাতীয়বাদশূন্য আমার জগতে তার কোনও স্থান নেই।'

''গান্ধীজীর সঙ্গে নেতাজীর ছিল এইখানেই সবচেয়ে বড় তফাত।...

''ধর্ম মানুষের একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়। নেতাজী বলেছিলেন, '[কেবলমাত্র] ধর্মের নামে তোমরা যদি এক হও, জাতীয়তাবাদের নামে তোমাদের ভাগাভাগি হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। কিন্তু তোমরা যদি জাতীয়তাবাদের নামে এক হও, তাহলে আর বিভক্ত হবার প্রশ্ন থাকছে না।'

''নেতাজীর এই নীতিটি যে কত নিখুঁত ছিল—আজ [১৯৭৫ সালের কথা বলছেন হাসান সাহেব] আমরা তা মর্মে মর্মে অনুভব করছি।"[১০]

প্রকৃত নেতা কখনও তাঁর নিজস্ব ভাব বা শিক্ষা তাঁর অনুগামীদের ওপরে চাপিয়ে দেন না, তিনি তাঁদের উদ্দীপিত করেন, উদ্বুদ্ধ করেন কোনও একটি মহান আদর্শের প্রতি। তাঁর চোখে সর্বোচ্চ আদর্শের যে-স্বপ্ন রয়েছে, তাঁর অনুগামীদের চোখেও সেই স্বপ্ন-অঞ্জন লাগিয়ে দিতে পারেন তিনি। নেতাজী সেই দুরূহ কাজটি করতেন অনায়াস দক্ষতায়। তার ফলে তাঁর অনুগামীরা নেতাজীর বশংবদ চিন্তাদাস না হয়ে নিজেরাই স্বাধীনভাবে চিন্তা করতেন কীভাবে নেতাজীর আদর্শকে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করা যায়। হাসান সাহেব লিখছেন :

''নেতাজি আমাদের এতখানি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন যে, এই সময় আমরা একটি অসাধ্যসাধন করে ফেলেছিলাম। [এটাই তো প্রকৃত নেতার কাজ!]

''আমাদের বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মানুষদের খাদ্যাভ্যাসটি বড় জটিল। এমনকী অনেকসময় ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারটিও মারাত্মক আকার ধারণ করে থাকে, বিশেষ করে মাংস খাওয়া নিয়ে। নেতাজি এই ব্যাপারে আমাদের উদার হতে সাহায্য করেছিলেন।

''খাদ্যরুচির কথা আলাদা, কিন্তু সংস্কারমুক্তি হয়েছিল আমাদের। এক রান্নাঘরের কাউন্টার থেকে সব ধর্মের মানুষ খাবার নিয়ে এসে একসঙ্গে বসে খেত। আমরা যে এক, আমাদের চলার পথ একটাই—এই বোধ আমাদের মধ্যে এইভাবেই সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন নেতাজি।

''সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার ব্যাপারে আমরা খুব তৎপর ছিলাম। সবাই বুঝে গিয়েছিলাম, 'সংহতি না থাকলে আমরা এগিয়ে যেতে পারব না কিছুতেই।'[১১]

নেতাজী তাঁর এই অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের অমোঘ প্রভাব (বা তন্মাত্রা) তাঁর অনুগামীদের মধ্যে এতটাই ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন যে আবিদ হাসান সাহেব জানিয়েছেন—

''তখন, সেই আমলে [জার্মানিতে] সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সংহতি রক্ষা করার জন্য একটা সহজ উপায় খুঁজে বার করার জন্য ছটফট করতে শুরু করে দিয়েছিলাম আমরা।

সেই প্রচেষ্টার সুফল ফলেছিল অচিরেই।

''[আজাদ হিন্দ বাহিনীর সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে দেখা হলে পরস্পরকে কী বলে অভিবাদন জানাবেন, সেই অসাম্প্রদায়িক শব্দটি কী হওয়া উচিত, এই চিন্তাটি] দিনরাত আমার মাথার মধ্যে... ঘুরছিল।... একদিন ভাবলাম, আচ্ছা... 'জয় হিন্দুস্তান

কি' করলে কেমন হয়? কিন্তু...কিন্তু ভারী এই শব্দটির মধ্যে... সহজ-সরল মূর্ছনাটি নেই।

''কিছুক্ষণ পরে আর একটি ভাবতরঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছিল আমার মাথায়। আচ্ছা, 'হিন্দুস্তান'-এর বদলে যদি 'হিন্দ্' বলি। 'জয় হিন্দ্ কি' করলে কেমন হয়? কিংবা...কিংবা...এবার বুঝি বিদ্যুৎ খেলে গেল...'জয় হিন্দ্ কি' নয়, শুধু 'জয় হিন্দ্'।

''আবার ছুটলাম নেতাজির কাছে।

''এবার আর তিনি বকুনি দিলেন না। উজ্জ্বল মুখে ছাড়পত্র দিলেন জাতীয় অভিবাদনটিকে।... তারপরেই 'জয় হিন্দ্' ছড়িয়ে পড়েছিল মুখে মুখে।''[১২]

এই কেন্দ্রের অন্যান্য কর্মকাণ্ডের পরিচিতি নিষ্প্রয়োজন, তা এখন ইতিহাসের পাতায় চিরস্থায়ী আসন পরিগ্রহ করেছে।[১৩]

তিন

এরপরে, সামরিক প্রয়োজনে নেতাজী তাঁর কর্মকেন্দ্র সরিয়ে আনলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। এক দুঃসাহসিক এবং তুলনারহিত সমুদ্রযাত্রা (সাবমেরিনে) করে তিনি আর তাঁর সঙ্গী কর্নেল আবিদ হাসান এসে পৌঁছলেন জাপানে। সেখান থেকে বিপ্লবগুরু রাসবিহারী বসুর সঙ্গে তিনি সিঙ্গাপুরে এসে পৌঁছলেন ৩ জুলাই ১৯৪৩। পরের দিন (৪ জুলাই ১৯৪৩) সিঙ্গাপুরের ক্যাথে থিয়েটার হলে অসংখ্য মানুষের উপস্থিতিতে রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রের হাতে তুলে দিলেন ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লিগ এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বময় নেতৃত্বের দায়িত্ব। নেতাজী আজাদ হিন্দ বাহিনীর সামনে তিনি তাঁর বিখ্যাত ডাক দিলেন—'চলো দিল্লি'।[১৪] এইসব ইতিহাস সবাই জানেন, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।[১৫]

কিন্তু একটি সম্ভাব্য বিপদের অপচ্ছায়া তখনও রয়ে গেল। আজাদ হিন্দ বাহিনীতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ (সামরিক ও অসামরিক) রয়েছেন। ব্রিটিশ সরকারের গুপ্ত এজেন্টরা সর্বতোভাবে চেষ্টা চালাবে এই বাহিনীর মধ্যে ধর্মীয় বিভেদের সুযোগ নিয়ে অন্তর্ঘাত চালাতে। অর্থাৎ, তারা সাম্প্রদায়িকতার সেই সুপরিচিত কৌশলটা এখানেও প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হবে। সেটা অনুমান করে নেতাজী তাঁর অনুপম নেতৃত্ব দিয়ে সমস্ত বিভেদমূলক সাম্প্রদায়িকতার মূলোচ্ছেদ করে দিয়েছিলেন।

এই সময়েই তিনি অনুভব করলেন, এই সরকার এবং সৈন্যবাহিনীর জন্য সহজবোধ্য হিন্দুস্তানি ভাষায় একটি সামরিক (martial) গান রচনা করা দরকার। তাঁর আদেশানুসারে ১৯৪৩ সালে মুমতাজ হুসেন (ইনি আজাদ হিন্দ রেডিওর একজন লেখক ছিলেন) এবং কর্নেল আবিদ হাসান সাফরানি মিলিতভাবে একটি গান রচনা করলেন—'শুভ সুখ চৈন কী বরখা বরষে...'। তারপর নেতাজীর কথামতো ক্যাপ্টেন রাম সিং ঠাকুরী (১৯১৪-২০০২) গানটিতে সুর-সংযোজন করলেন কবিগুরুর 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটির অনুষঙ্গে। সেই গানটিই আজাদ হিন্দ সরকারের (Provisional Government of Free India) জাতীয় সংগীতরূপে গৃহীত হয়েছিল। তিনটি স্তবকে বিধৃত এই গানটিতে ভারতবর্ষের তিনটি বিশেষত্বের কথা বলা হয়েছে। প্রথম স্তবকে রয়েছে এর আসমুদ্রহিমাচল-ব্যাপী বিস্তারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। দ্বিতীয় স্তবকে রয়েছে ভারতবর্ষের চিরন্তন অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যের মহতী বাণী। তৃতীয় স্তবকে এর অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে। আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে এই গানটি যখন গাওয়া হত তখন গায়ক এবং শ্রোতাদের অন্তরে অন্তরে ভারতবর্ষের এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের ভাব সঞ্চারিত হয়ে যেত। আমরা গানটির দ্বিতীয় স্তবকটির উদ্ধৃতি দিচ্ছি (বঙ্গানুবাদ সহ) :

''সব কে দিল মে প্রীত বসায়ে তেরী মীঠী বাণী,

হর সুবে কে রহনেওয়ালে,
হর মজহব কে প্রাণী,
সব ভেদ অওর ফরক মিটা কে,
সব গোদ মেঁ তেরী আকে,
গুঁথে প্রেম কী মালা।
সূরজ বনকর জগ পর চমকে,
ভারত নাম সুভাগা,
জয় হো! জয় হো! জয় হো!
জয় জয় জয় জয় হো!"
—তোমার মিষ্টিমধুর বাণী প্রীতির জোয়ার আনে
সব প্রদেশের, সব ধর্মের সকল নরনারীর প্রাণে,
সব ভেদাভেদ মিটিয়ে শেষে
সবাই তোমার কোলে এসে
গাঁথে প্রেমের মালা।
জগতের পরে সূর্যের মতো জ্বলে
ভারতের পাবন নাম।
জয় হোক! জয় হোক! জয় হোক!
জয় জয় জয় জয় হোক!

চার

নীতি (ধর্মনিরপেক্ষতা) আর বাস্তব প্রয়োজন (অর্থসংগ্রহ) এই দুয়ের মধ্যে কখনও দ্বন্দ্ব বাধলে প্রকৃত নেতা কোনটা বেছে নেবেন? সামরিক প্রয়োজনে নেতা কি তাঁর নীতিকে সাময়িকভাবে কিছুটা নমনীয় করে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবেন? নাকি, সবার ওপরে নীতিই সত্য, তাহার উপরে নাই? নেতাজীর অয়স্কঠিন নেতৃত্বের অনুধ্যান কালে এই প্রশ্নটি উঠে আসবেই। নেতাজী তখন সিঙ্গাপুরে এসে আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। শত্রুপক্ষও হাত গুটিয়ে বসে নেই। ব্রিটিশের বেতনভোগী চররা নেতাজীর বিরুদ্ধে নানারকম অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য কাজ ছিল ভারতীয়দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানো। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য একেবারেই ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল, সিঙ্গাপুরের জনসমাবেশে নেতাজীর সেই বীরোদাত্ত ভাষণের আগুনে ভস্ম হয়ে গিয়েছিল এইসব হীন প্রয়াস। সব সম্প্রদায়ের মানুষের চোখের মণি হয়ে উঠেছিলেন তিনি। প্রত্যক্ষদর্শী আবিদ হাসান সাহেব (নেতাজীর সচিব) এই সময়কার একটি আবেগঘন ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর নিজের ভাষাতেই ঘটনাটা শোনা যাক।

''তিনি [নেতাজী] শুধু হৃদয়বান নন, অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বাস্তববাদী মানুষ ছিলেন। [তিনি জানতেন যে] দেশ উদ্ধারের জন্য জীবন উৎসর্গ করা সবচেয়ে বড় কাজ, কিন্তু একমাত্র কাজ নয়। প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র দরকার, আর সে সব জোগাড় করতে গেলে যা দরকার তা হল অর্থ। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার, গোড়ার দিকে এমন কিছু লোকের দেখা মিলেছিল যাঁরা দেশের জন্য রক্ত দিতে প্রস্তুত, কিন্তু টাকাপয়সার কথা তুললেই আমতা-আমতা করে সরে পড়তেন।

''তবে, এই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হয়েছিল [বোঝাই যাচ্ছে, এর পেছনে ছিল স্বয়ং নেতাজীর অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব]। মালয় ও সিঙ্গাপুরে আমাদের অর্থসংগ্রহ ভালই হচ্ছিল। অর্থের সবচেয়ে বড় অংশটা আসত অবশ্য চেটিয়ার সম্প্রদায়ের কাছ থেকে। সিঙ্গাপুরে এঁদের অনেকেই তখন বাস করতেন। এঁরা ছিলেন অত্যন্ত ধনী।

''একটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া যেতে পারে। পুরো দৃশ্যটি আজও ছবির মতো আমার চোখের সামনে ভাসে। দশেরা উৎসবের ঠিক আগের দিন চেটিয়ার সম্প্রদায়ের প্রধান পুরোহিত আরও দু-তিনজন পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন আমার কাছে। নেতাজির সঙ্গে দেখা করতে চান তাঁরা। কিন্তু [আগে থেকে] কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেননি। আমি ইতস্তত করছিলাম।

নেতাজির প্রতিটি মুহূর্তই কাজে ঠাসা। এভাবে [হঠাৎ তাঁর কাছে] নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে কি!

''অন্য কেউ হলে ভাগিয়ে দিতাম সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু এঁদের মুখের ওপর 'না' বলার সাহস ছিল না আমার। টাকাপয়সার ব্যাপারে আমাদের বলভরসা বলতে এই চেটিয়ারাই [চেটিয়াররাই]। এঁরা চটে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে সর্বনাশ।

''কয়েক মুহূর্ত দোনামনা করার পর নিয়েই গেলাম ওঁদের নেতাজির কাছে।

'' 'কী ব্যাপার?' প্রশ্নের উত্তরে ওঁরা খুব বিনয়ের সঙ্গে বললেন : কাল দশেরা উৎসব। আপনি যদি দয়া করে একবার মন্দিরে আসেন, আমরা সবাই খুব খুশি হব।

''কিন্তু ওঁদের এ-ভাবে খুশি করার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় ছিল না নেতাজির। গম্ভীর গলায় জানালেন, 'আপনারা যে মন্দিরে আমাকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে যাচ্ছেন, সেই মন্দিরের দরজা মুসলমান, খ্রিস্টানদের জন্য বন্ধ। এমনকী নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও ওখানে গিয়ে প্রার্থনা করার সুযোগ পান না। যাঁরা অস্পৃশ্যতা জিইয়ে রাখতে চান, তাঁদের নিমন্ত্রণ আমার পক্ষে রাখা সম্ভব নয়। আপনারা আসুন।'

''পুরোহিতদের রূঢ়ভাবে বিদায় করে দেওয়ার ঘটনাটি দেখে আমি ভেতরে ভেতরে বেশ শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের টাকাপয়সার উৎস এবার নির্ঘাৎ শুকিয়ে যাবে। আবার, এও জানি, নেতাজি অন্যায়ের সঙ্গে [সঠিকার্থে, নীতির প্রশ্নে] কোনও অবস্থাতেই আপস করবেন না সুতরাং বেশ বড় ধরনের একটা সংকট তৈরি হতে যাচ্ছে।[১৬]

''দশেরা উৎসবের উদ্বোধন হবে পরদিন বিকেল পাঁচটায়। পরদিন পাঁচটা বাজার ঠিক আধঘণ্টা আগে ওই পুরোহিতের দল আবার এসে হাজির। নেতাজির সঙ্গে [আবার] দেখা করতে চান [তাঁরা]।

''আমি বললাম, 'অসম্ভব। নেতাজি আপনাদের সঙ্গে দেখা করবেন না।'

''ওঁরা অনুনয়-বিনয় শুরু করে দিলেন : দু-মিনিটের বেশি সময় নেব না আমরা।

''সেদিন পাহারায় ছিল জবরদস্ত দুজন গাড়োয়ালি। একবার ভাবলাম ওদের দিয়ে পুরোহিতের দলটাকে তাড়িয়ে দিই। কিন্তু সাহস পাচ্ছিলাম না। প্রভাবশালী এবং ধনীদের বিরুদ্ধে যাওয়া সহজ নয়। বললাম, 'ঠিক আছে, যান, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই দু-মিনিটের বেশি সময় নেবেন না।'

''পুরোহিতদের [পুনরায়] দেখেই নেতাজি চটে গিয়েছিলেন। ওঁরা অনেক কষ্টে ওঁকে শান্ত করে বললেন : 'আপনার মনোমতো হবে, এমন একটি প্রস্তাব নিয়েই আজ আমরা আপনার কাছে এসেছি। দশেরা উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে মন্দির-প্রাঙ্গণে আজ আমরা একটি জনসমাবেশের আয়োজন করেছি। ওখানে আসার জন্য আমরা মুসলমান, খ্রিস্টান ইত্যাদি সব সম্প্রদায় এবং সব বর্ণের হিন্দুকেই ডেকেছি। আপনি অনুগ্রহ করে ওই সমাবেশে বক্তৃতা দেবেন।'

''যেহেতু জনসমাবেশ, নেতাজি আর আপত্তি তুললেন না [এত শর্ট নোটিসেও!]। বললেন, 'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।'

''ওই সমাবেশে নেতাজির অন্যতম সঙ্গী ছিলাম আমি। [বলা বাহুল্য, হাসান সাহেব মুসলমান।] ওখানে গিয়ে যা দেখেছিলাম তা বিস্ময়কর। গোটা দৃশ্যটি যে ভাষায় প্রকাশ করব—এমন ক্ষমতা আমার সত্যিই নেই।

''কোনও এক আশ্চর্য জাদুতে মন্দিরের চেহারা বোধহয় পালটে গিয়েছিল একদম। মন্দির-প্রাঙ্গণ কালো টুপিতে ভরে গিয়েছিল। সাবেক ধাঁচের ওই টুপিগুলো দক্ষিণ ভারতীয় মুসলমানদের। শুধু মুসলমান নয়, সব জাতি, সব বর্ণের মানুষদের সমাবেশ হয়েছিল মন্দির-এলাকায় [নেতাজীর আকর্ষণে তাঁরাও সবাই ছুটে এসেছেন]। এ এক

অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্য!

''পুরোহিতরা মহা সমাদরে বরণ করলেন বরেণ্য অতিথি নেতাজিকে। ওঁর কপালে এঁকে দেওয়া হল তিলক। তিলক লাগানো হল আমার কপালেও। [নেতাজীর সর্বগ্রাসী ব্যক্তিত্বের প্রবল ক্ষমতা! তাঁর দিব্য উপস্থিতিতে কীভাবে দক্ষিণ-ভারতীয় হিন্দু-মন্দির সব ধর্মের ভারতীয়দের মহামিলনের জগন্নাথক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গেল! হিন্দু পুরোহিত সসম্মানে ধর্মীয় তিলক এঁকে দিচ্ছেন তাঁর মুসলমান ভাইয়ের ললাটে, আর হাসান সাহেবও তা শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করছেন কোনও ধর্মীয় আপত্তি না তুলে!] তারপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হল পবিত্র মন্দিরে। আমি মুসলমান, কিন্তু আমাকে নিয়ে ওঁদের কোনও দ্বিধা ছিল না [দ্বিধা ছিল না হাসান সাহেবের মনেও]।[১৭]

''বিশাল মন্দির-প্রাঙ্গণ ভরে গিয়ে গিয়েছিল সব ধর্মের মানুষে। ওই সমাবেশে প্রদত্ত নেতাজির বক্তৃতাটি ছিল বিস্ময়কর। এমন মর্মস্পর্শী ও উদ্দীপক বক্তৃতা আমি খুব কমই শুনেছি। নেতাজি বললেন : জাতিধর্মের অনেক ওপরে আমাদের পরিচয়। আমরা মানুষ। আমরা আবার পরাধীন দেশের মানুষ। আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত দেশোদ্ধার। জাতীয়তাবাদই একমাত্র সত্য। আমরা যতক্ষণ এক, ততক্ষণ অজেয়।

''এই ঐক্যের বাণী সেদিন তিনি আমাদের শুনিয়েছিলেন। ভবিষ্যৎ-ভারতের যে ছবি তিনি এঁকেছিলেন তার সুষমা ও গরিমা সেদিন আমাদের সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।''[১৮]

নেতাজীর এই অসাম্প্রদায়িক নেতৃত্ব প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ করতেই হবে বীর শিখজাতির নেতা গুরু গোবিন্দ সিংহের কথা। তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন স্বামীজী। গুরুজীর কথা বলতে বলতে স্বামীজী ভাবোদ্বেল হয়ে উঠতেন। তাঁর 'ধর্মমহিমাসূচক... কথাগুলি বলিতে বলিতে স্বামীজীর উৎসাহ-বিস্ফারিত নয়নে... তেজ ফুটিয়া বাহির' হত, জানিয়েছেন শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। শরৎবাবু লিখেছেন, ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের কোনও একদিন (সম্ভবত গ্রীষ্মকালে) বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ির ছাদে 'বেড়াইতে বেড়াইতে স্বামীজী গুরুগোবিন্দের কথা পাড়িয়া তাঁহার ত্যাগ, তপস্যা, তিতিক্ষা ও প্রাণপাতী পরিশ্রমের ফলে শিখজাতির কিরূপে পুনরভ্যুত্থান হইয়াছিল, কিরূপে তিনি মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তিগণকে পর্যন্ত দীক্ষা দান করিয়া পুনরায় হিন্দু করিয়া শিখজাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন' তা শিষ্যকে বুঝিয়েছিলেন। আশ্চর্য হয়ে শিষ্য স্বামীজীকে প্রশ্ন করলেন,

''মহাশয়, ইহা কিন্তু বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার যে, গুরুগোবিন্দ হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া একই উদ্দেশ্যে চালিত করিতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঐরূপ দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দেখা যায় না।''

প্রত্যুত্তরে স্বামীজী ব্যাখ্যা করে বোঝালেন—

''Common interest না হলে (একপ্রকারের স্বার্থচেষ্টা ভিতরে অনুভব না করিলে) লোক কখনও একতাসূত্রে আবদ্ধ হয় না। সভা সমিতি লেকচার করে সর্বসাধারণকে কখনও unite (এক) করা যায় না—যদি তাদের interest (স্বার্থ) না এক হয়। গুরুগোবিন্দ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তদানীন্তন কালের কি হিন্দু, কি মুসলমান—সকলেই ঘোর অত্যাচার-অবিচারের রাজ্যে বাস করিতেছে। গুরুগোবিন্দ common interest create (একপ্রকারের স্বার্থচেষ্টার সৃষ্টি) করেন নাই, কেবল উহা ইতরসাধারণকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র। তাই হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁকে follow (অনুসরণ) করেছিল। তিনি মহা শক্তিসাধক ছিলেন। ভারতের ইতিহাসে তাঁহার ন্যায় দৃষ্টান্ত বিরল।''[১৯]

গুরু গোবিন্দজীর নেতৃত্বগুণের সঙ্গে নেতাজীর নেতৃত্বের অনেক মিল পাওয়া যায়। গুরু

গোবিন্দজীর অপার কৃপাশক্তিও নেতাজীর মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল বলে মনে হয়।

প্রথমত গুরু গোবিন্দজীর মতো নেতাজীও 'মহা শক্তিসাধক' ছিলেন। অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যে তাই জানা যায়। তাঁর সেই সাধন-সঞ্জাত সুবিপুল আধ্যাত্মিক শক্তিই আজাদ হিন্দের প্রতিটি সেনানীকে এবং প্রতিটি অনুগামীকে প্রেরণা দিত। সেই সাধনলব্ধ শক্তির জোরে নেতাজীও বলতে পারতেন—'আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগো রে সকল দেশ'।

দ্বিতীয়ত নেতাজীও তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনীতে সবরকম ধর্মের মানুষকে সসম্মানে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ধর্মগুরু বা দীক্ষাগুরু ছিলেন না। তাই তিনি কারও ধর্মে হাত দেননি, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য নেতাজী সেইরকম কাজ করতেই পারেন না। তবে তিনি সকলের নিজস্ব ধর্ম বজায় রেখেও তাঁদের সকলকে এক নতুন অসাম্প্রদায়িক ধর্মে উন্নীত করেছিলেন, সেটি হল ভারতীয়ত্ব। সকলকেই তিনি বুঝিয়েছিলেন, তাঁরা যেন নিজেদের স্বাধীন ভারতের নাগরিক বলে মনে করেন এবং সেই গর্বে গর্বিত হয়ে মাথা উঁচু করে বিচরণ করেন। অসাধারণ চরিত্রবলে বলীয়ান হয়ে তিনি সবাইকে বোঝাতে পেরেছিলেন, ''তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' [দেশমাতৃকা] জন্য বলিপ্রদত্ত।" সকল রকম সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে তিনি বলতে পেরেছিলেন, তুমি ''ভারতবাসী, সকল ভারতবাসী তোমার ভাই, ভারতের মৃত্তিকা তোমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ তোমার কল্যাণ।"

তৃতীয়ত নেতাজীও কোনও common interest create করেননি, কেবল ইংরেজের রাজত্বে 'তদানীন্তন কালের কি হিন্দু, কি মুসলমান [এবং, সেই সঙ্গে, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী সকল পরাধীন ভারতীয়]—সকলেই ঘোর অত্যাচার-অবিচারের রাজ্যে বাস করছে' সেটা তিনি তাঁর উদ্দীপক ভাষণে সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তাই সবাই তাঁকে নতমস্তকে 'নেতাজী' বলে মেনে নিয়ে অনুসরণ করেছিলেন। সত্যিই, গুরু গোবিন্দ সিংহের পরে 'ভারতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।'

চতুর্থত অধ্যাত্মগুরুদের সাধারণ লক্ষণ এই যে তাঁরা তাঁদের শিষ্য ও অনুগামীদের মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত করতে পারেন। শিখধর্মের দশম সঙ্ঘগুরু গোবিন্দ সিংহেরও সেই ক্ষমতা ছিল (প্রচলিত বিশ্বাস, কোনও ধর্মপরম্পরার দশম সঙ্ঘগুরুর মধ্যে বিশেষ আধ্যাত্মিক ক্ষমতার প্রকাশ দেখা যায়)। তাঁর সম্বন্ধে স্বামীজীর শ্রদ্ধার্ঘ্য—

''গুরুগোবিন্দের নিকট দীক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে তখন যে কি মহাশক্তি সঞ্চারিত হইত [ঈশ্বরের প্রেরিত ধর্মগুরুদের সাধারণ লক্ষণ এটি], তাহার উল্লেখ করিয়া স্বামীজী শিখ্‌জাতির মধ্যে প্রচলিত একটি দোঁহা আবৃত্তি করিয়া বলিলেন :

''সওয়া লাখ পর এক চড়াউঁ।
যব্ গুরু গোবিন্দ্ নাম শুনাউঁ॥

''অর্থাৎ গুরু গোবিন্দের নিকট নাম (দীক্ষা) শুনিয়া এক এক জন ব্যক্তিতে সওয়া লক্ষ সংখ্যক ব্যক্তি অপেক্ষাও অধিক শক্তি সঞ্চারিত হইত! অর্থাৎ—তাঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিলে তাঁহার শক্তিতে জীবনে যথার্থ ধর্ম্মপ্রাণতা উপস্থিত হইয়া গুরু গোবিন্দের প্রত্যেক শিষ্যের অন্তর এমন অদ্ভুত বীরত্বে পূর্ণ হইত যে, সে তখন সওয়া লক্ষ বিধর্ম্মীকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইত।"[২০]

নেতাজীর উদ্দীপক ভাষণে শ্রোতাদের রক্তস্রোতে আগুন ধরে যেত, সর্বস্ব ঢেলে দিতে তাঁরা ছুটে আসতেন নেতাজীর পদতলে—একথা অসংখ্য সাক্ষ্যে আজ প্রমাণিত সত্য। নেতাজীর বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনীর বীর সেনানীরা দুর্বিষহ কষ্ট সহ্য করে যুদ্ধ করেছেন, প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন ইম্ফল আর কোহিমার

রণক্ষেত্রে। তাঁদের সেই ভীম-প্রহারে জর্জরিত হয়ে ইংরেজ বাহিনীকে বারবার 'সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ' করতে হয়েছে।

পঞ্চমত নিজের সব কর্ম সমাপন করে গুরু গোবিন্দজী 'নর্মদাতীরে মানবলীলা সংবরণ করেন।' নেতাজীও তাঁর বিধিনির্দিষ্ট কর্ম সমাপন করে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেলেন (১৮ আগস্ট ১৯৪৫)।

পাঁচ

নিজের মাধুর্যময় ব্যক্তিত্বের জোরে নেতাজী কীভাবে আবালবৃদ্ধবনিতার মন জয় করতে পারতেন তার বর্ণনা দিয়েছেন আবিদ হাসান সাহেব :

''শুধু বড় মানুষজন নন, দেশের অসংখ্য সাধারণ মানুষের প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল। মুহূর্তের মধ্যে সবাইকে আপন করে নিতে পারতেন। সিঙ্গাপুরের প্রথম বক্তৃতাতেই তিনি প্রবাসীদের হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন। নেতাজিকে দেখে, তাঁর কথা শুনে [সকলের] সে কী উন্মাদনা!

''সব সমাবেশেই এক দৃশ্য। দেশের জন্য প্রাণ দেওয়ার যেন হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল। প্রাণ এবং সম্পদ। যার যা আছে তা-ই নিয়েই সবাই এগিয়ে এসেছিল। জীবনপণ লড়াইয়ের জন্য অস্ত্র দরকার, খাদ্য দরকার, বস্ত্র দরকার। সমাবেশে অনেক মহিলা তাঁদের হাতের বালা, কানের দুল পর্যন্ত খুলে দিতেন।

''সাড়া দিয়েছিলেন সর্বস্তরের মানুষ। এক সভায় গোয়ালারা তাঁদের দুশোটি গরু নিয়ে হাজির হয়েছিলেন।

''গরু! গরু কেন?

''কেন আবার! গরুর দুধ খেয়ে তাগদ বাড়াবে জওয়ানরা; দেশের জন্য তবেই না লড়তে পারবে।

''এক বৃদ্ধ গোয়ালা-দম্পতি নেতাজির কাছে এসে হাত জোড় করে বলেছিলেন, 'সাব, আমাদের দশটা গরু আছে, এগুলো আপনাকে দিচ্ছি। আমার দুটি জওয়ান ছেলে আছে—আপনাকে দিচ্ছি। আমার এক মেয়ে আছে—আপনাকে দিচ্ছি। আমাদের টাকা পয়সা যা আছে—সব আপনাকে দিচ্ছি। আমরা বুড়ো হয়ে গেছি, না হলে আমরাও...। আমাদের সবকিছু আপনার সেবায়, দেশের সেবায় উৎসর্গ করলাম।

''সামরিক বাহিনীর সদস্যদের কাছ থেকেও অকৃত্রিম ভালবাসা পেয়েছিলেন নেতাজী। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পা দেওয়ার মাত্র ন-মাসের মধ্যে বিরাট এক ফৌজ গঠন করেছিলেন তিনি।''[২১]

নেতাজীর নিজস্ব ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি ছিল তুলনারহিত। তাঁর মমতাময় নেতৃত্ব প্রসঙ্গে অধ্যাপক সমর গুহ লিখেছেন :

''...[নেতাজী] ভারতের জনচিত্তকে জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন এজন্যে যে তাঁর অন্তরে জনসাধারণের জন্য ছিল গভীর দরদ ও মমত্ববোধ। বুদ্ধির অনুশীলনদ্বারা এই মমত্ববোধ সুভাষচিত্তে সঞ্চারিত হয়নি, আধ্যাত্মিক একাত্মবোধে [বিবেকানন্দের] মত নেতাজীও ভারতবাসীকে পরমাত্মীয়তার আমন্ত্রণে আপন করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। জনচিত্তকে আপন করে নেওয়ার উপরে নির্ভর করে মহতী নেতৃত্বের সার্থকতা এবং এজন্যেই... নেতাজীর পরিচয় ভারতের অপ্রতিম জননেতা রূপে।''[২২]

আবিদ হাসান সাহেবের রচনা থেকে আরও কিছু উদাহরণ দেখা যাক—

''গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন এমন প্রায় সব অফিসারের সঙ্গেই তিনি ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন। মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটও পরিদর্শন করতেন নিয়মিত ভাবে। [এইভাবে স্বয়ং নেতাজীর সাক্ষাৎ-দর্শন নিয়মিত পেয়ে প্রতিটি আজাদ হিন্দ

সেনানীর মনে যে বিপুল আনন্দ, উৎসাহ, উদ্দীপনা, সাহস আর দেশের জন্য প্রাণবিসর্জন দেওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা সঞ্চারিত হত, তা সহজেই অনুমেয়।] [তখন] অফিসার এবং জওয়ানদের জন্য ছিল আলাদা-আলাদা কিচেন। দুটি রান্নাঘরেই তিনি ঢুঁ মারলেন একদিন। দু-জায়গার খাবার চেখে দেখে বললেন, এ কী! এত তফাৎ কেন? অফিসারদের খাবারদাবারের মান তো অনেক ভাল।

''বলার পরদিন থেকেই দূর হয়েছিল বৈষম্য।

''[শুধু আদেশ দেওয়াই নয়, তাঁর সেই আদেশ কতটা মানা হচ্ছে সেটা সরেজমিনে দেখবার জন্য নেতাজী হঠাৎ] একদিন লাঞ্চটাইমে হাজির হয়ে বললেন, 'আমি আজ তোমাদের সঙ্গে খাব। কিন্তু কোথায় খাব? অফিসারদের সঙ্গে, না জওয়ানদের সঙ্গে?' [জিজ্ঞাসা করবার কী সুন্দর পদ্ধতি দেখুন! কারও মনে কোনও রকম আঘাত না দিয়ে কীভাবে বলা যায় তার উজ্জ্বল এক দৃষ্টান্ত যা আজও আমরা প্রাত্যহিক জীবনে কাজে লাগাতে পারি।]

''[নেতাজীর আসল উদ্দেশ্য বুঝে বুদ্ধিমান] কম্যানডার ঘাড় চুলকে বললেন, 'আপ তো জওয়ানকো পাস খায়েঙ্গে?'

''[নেতাজীও কম বুদ্ধিমান নন।] সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়েছিলেন নেতাজি। 'হাঁ, ইয়ে তো বহুতই আচ্ছা খ্যাল হ্যায়।'

''ব্যস। তারপরেই বসে গেলেন জওয়ানদের সঙ্গে খানা খেতে।''[২৩]

অভিভূত আবিদ হাসান জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে লিখেছেন : ''মস্ত এক মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক কখনই ঘেরাটোপের আড়ালে থাকতেন না। [কত বড় সাহসের কথা ভাবুন! সেই সংকটময় ক্ষণে যেকোনও সময়ে ইংরেজের গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হওয়ার প্রবল সম্ভবনা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মাতৃসাধক নেতাজীর এই বীরোচিত বিচরণ আজ কল্পনাও করা যায় না।] সময় খুবই কম, কিন্তু [তার মধ্যেই সময় করে] যতটা পারতেন সবার সঙ্গে মিশতেন, উজ্জীবিত করতেন। সবাইকে একটিমাত্র স্বপ্নই দেখতে শিখিয়েছিলেন তিনি—তা হল, মাতৃভূমির উদ্ধার। একটিই কাজ—তা হল, জীবনপণ করে দেশের জন্য সংগ্রাম।''[২৪] ✠

তথ্যসূত্র

১। Florence Minz and Dr. Shruti Mishra, *Ekam Sad Vipra Bahudha Vadanti : A Vedic Consciousness of God*, Adhigam, Vol. 17, December 2020, p. 129-138

২। কল্যাণী কাজী (সম্পাদনা), *কাজী নজরুলের গান*, সংগীত সংখ্যা : ২২৯০, সাহিত্য ভারতী পাবলিকেশনস্, কলকাতা, পৃঃ ৬৫০

৩। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ*, 'ভারতীয় সংহতির প্রশ্নে স্বামী বিবেকানন্দ' (পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায়), খণ্ড ৪, ১৩৮৮, মন্ডল বুক হাউস, কলকাতা, পৃঃ ৩৪১-৪০২

৪। Hemendranath Das Gupta, *Deshbandhu Chittaranjan Das*, Chapter XIV, Bengal Pact, January 1960, The Publication Department, Govt. of India, Delhi, p. 100-104

৫। বরেণ্য ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার 'ইতিহাসে আনন্দবাজার' নামক একটি বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন, ''...১৯৪১ সালে সুভাষচন্দ্রের অপ্রত্যাশিত গৃহত্যাগের সংবাদটি শুধুমাত্র আনন্দবাজার পত্রিকায়ই প্রকাশিত হয়। ২৬ জানুয়ারি গভীর রাতে শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার খবরটি আনন্দবাজারকে দেন। এই খবরটি প্রকাশের পরেই জনসাধারণ এবং ব্রিটিশ সরকার জানতে পারে সুভাষচন্দ্র আর গৃহবন্দী নন।...''

দ্রঃ ইন্দ্রমিত্র, *ইতিহাসে আনন্দবাজার*, আনন্দ

পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৭৫।

৬। নন্দ মুখোপাধ্যায়, *সুভাষচন্দ্র ও নাৎসী সরকার*, জয়শ্রী প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৪

৭। N. G. Banpuley, Netaji in Germany: A Little-Known Chapter, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1959

৮। এই গানটির রচনাকাল নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না, রবীন্দ্র-পরিকর সুধীরচন্দ্র কর মহাশয় এই বিষয়ে 'রবীন্দ্র-জীবনী'কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতামত জানিয়েছেন : ''১৯১১ সনের ১২ থেকে ১৮ ডিসেম্বরের মধ্যে কোনও একদিন এ-গানটি যে রচিত হয়েছিল সে বিষয়ে নানাদিকের তথ্যবিচারে তিনি [প্রভাতবাবু] নিঃসন্দেহ হয়েছেন।'' ওই সময়েই, অর্থাৎ ''১৯১১ সনের ডিসেম্বরে ভারতীয় কংগ্রেসের... পূর্ণাঙ্গ-অধিবেশনেই ঘটেছিল... 'জনগণমন'-গানটির প্রথম প্রকাশ্য-আবির্ভাব।''
দ্রঃ সুধীরচন্দ্র কর, *জনগণমন-অধিনায়ক (ভারতের 'জাতীয় সংগীত' রচনা কাহিনির নাট্যধর্মী বিচিত্র আলেখ্য)*, গ্রন্থকারের নিবেদন, পারমিতা প্রকাশন, বোলপুর, ১৯৬২, পৃঃ ২০, ২৭

৯। শেখর বসু, *ডুবোজাহাজে নেতাজী*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৭, পৃঃ ১৯-২০

১০। তদেব, পৃঃ ২২

১১। তদেব, পৃঃ ২০

১২। তদেব, পৃঃ ২৩-২৪

১৩। নিমাইসাধন বসু, *দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র : এক ঐতিহাসিক কিংবদন্তি*, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৭, পৃঃ ২৫০-৫১

১৪। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, *দিল্লী চলো* (আজাদ হিন্দ গ্রন্থমালা), বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৫২

১৫। Peter Ward Fay, *THE FORGOTTEN ARMY : India's Armed Struggle for Independence 1942-1945*, Rupa Publications India Pvt. Ltd., New Delhi, 2015

১৬। এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর কথা স্মরণ করছি। তিনি একবার তাঁর 'শিষ্য'কে (শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী) নানারকম জনসেবামূলক কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করছিলেন। সতর্ক শিষ্য স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলেছিলেন—''...ঐরূপ করা ত অনেক অর্থসাপেক্ষ, টাকা কোথায় পাইবেন?'' এর উত্তরে স্বামীজী এইসব সেবাকর্মের জন্য টাকাপয়সা সংগ্রহের একটি অব্যর্থ পন্থা নির্দেশ করেছিলেন। [দ্রঃ শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, *স্বামি-শিষ্য-সংবাদ* (পূর্ব কাণ্ড), দ্বাদশ বল্লী, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩২৮, পৃঃ ১৪] শিষ্যকে আশ্বাস দিয়ে ভাবঘন কণ্ঠে বলেছিলেন, ''তুই কি বলছিস্? মানুষেই ত টাকা করে। টাকায় মানুষ করে, এ কথা কবে কোথায় শুনেছিস্? তুই যদি মন মুখ এক কর্‌তে পারিস্, কথায় ও কাজে এক হতে পারিস্ ত জলের মতো টাকা আপনা আপনি তোর পায়ে এসে পড়বে।''

নেতাজীর মন আর মুখ এক, কায়মনোবাক্যে অসাম্প্রদায়িক তিনি। তাই তিনি কোনও কারণেই তাঁর সেই নীতির সঙ্গে আপস করতে পারেন না। স্বামীজী-শিষ্য এবং স্বধর্মনিষ্ঠ নেতাজী নির্বিকার, তাতে যদি অর্থাগমের ব্যাঘাত হয় তো হোক। তিনি নীতিচ্যুত হবেন না কিছুতেই। অবশ্য তাতে অর্থাগমও ব্যাহত হয়নি। ''তুই যদি মন মুখ এক কর্‌তে পারিস্, কথায় ও কাজে এক হতে পারিস্ ত জলের মতো টাকা আপনা আপনি তোর পায়ে এসে পড়বে।''—স্বামীজীর এই অমোঘ ঋষিবাক্য কখনও বিফল হতে পারে না।

১৭। এই অভাবনীয় ঘটনার মাত্র চার দশক আগে ঘটে যাওয়া একটি স্বল্পজ্ঞাত ঐতিহাসিক সত্যের কথা এখানে আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে। ঘটনার নায়ক—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন [দ্রঃ *বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ*, মণ্ডল বুক হাউস, খণ্ড ২, ১৩৮৩, পৃঃ ১৭৫-৭৬] :

''তিনি [স্বামীজী] দেশে ফেরার পর

রামকৃষ্ণানন্দ-স্বামীকে মাদ্রাজে পাঠিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন সংগঠনের জন্য। বিস্ময়কর মানুষ রামকৃষ্ণানন্দ—হিসাবে ধরা যায় না তাঁকে।... মাদ্রাজে তিনি এমন মহিমার সঙ্গে বিরাজিত ছিলেন যে, সমকালীন সংবাদপত্রে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর উল্লেখ করা হত, এবং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়—মাদ্রাজে বিবেকানন্দের পরেই রামকৃষ্ণানন্দের স্থান।

''মাদ্রাজে উপস্থিত হওয়ার পরেই রামকৃষ্ণানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব শুরু করে দেন, এবং তা সমকালীন মাদ্রাজের সমাজজীবনে এমনই উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়ে ওঠে যে সংবাদপত্রগুলিতে তার সশ্রদ্ধ বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল। উৎসবগুলির যে-বৈশিষ্ট্য সংবাদপত্রের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হল মাদ্রাজের মতো নিতান্ত রক্ষণশীল জায়গায় উৎসবক্ষেত্রে সর্বশ্রেণীর নরনারীর সমাবেশ—সর্বশ্রেণীর হিন্দু নন কেবল—সেইসঙ্গে খ্রিস্টান ও মুসলমানও—এবং তাঁদের প্রসাদগ্রহণ। স্বীকার করতে হবে, সমাজসংস্কারক না হয়েও রামকৃষ্ণানন্দ সমাজসংস্কারকদের অসাধ্য কাণ্ড করেছিলেন, এবং বিনা আড়ম্বরে।

''মাদ্রাজ মেল ১৮৯৯, ২০ মার্চ উৎসবের মোটামুটি ভাল যে-বিবরণ লেখে, তার মধ্যে এই কথাগুলিও ছিল :

'...A large number of Hindus of all classes, most of them were English educated, took part in the celebration, which was throughout supervised by Swami Ramakrishnananda...An important feature of the day's proceedings was the feeding of nearly 3,500 poor of all castes, creeds and communities, among them were nearly 600 poor Mohamedan women and children... The Swami Ramakrishna-nanda... moved among the poor and personally attended to their wants,...'

''পরের বৎসরে একই ধরনের উৎসব আয়োজন [করা হয়েছিল], এবং ব্যাপারটির গুরুত্ব পুনশ্চ সংবাদপত্রের বিবরণে স্বীকৃত হয়।''

মাদ্রাজ মেল (১২ মার্চ ১৯০০) লিখেছিল :

''With The [Birthday] celebration brought together a large number of educated Hindus of Madras,... over 5 thousand poor of all castes, creeds and communities were fed. The Mohamedan poor of Triplicane and also a number of native Christian poor were among the hundreds who came to be fed.''

আমরা তাহলে বলতে পারি যে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অমোঘ প্রভাব স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়ে দক্ষিণ ভারতের রক্ষণশীল মানসিকতায় অনেক পরিবর্তন এনেছিল। সেই কারণে তাঁদের পরম্পরাগত রক্ষণশীলতার বন্ধন অনেকটাই শিথিল হয়ে গিয়েছিল, তাঁদের মানসক্ষেত্রে উপ্ত হয়েছিল ঔদার্য ও প্রগতিশীলতার বীজ। তার কিছুটা সুপ্রভাব সেই সময়ে সিঙ্গাপুরের চেট্টিয়ার মন্দিরে পড়েছিল নিশ্চয়ই। এর সঙ্গে নেতাজীর প্রবল ব্যক্তিত্বের প্রভাব এবং যুগের প্রভাব যুক্ত হয়ে সিঙ্গাপুরের চেট্টিয়ার মন্দির পরিষদের সুকঠিন রক্ষণশীল নীতিতে ফাটল ধরল এবং তার মধ্য দিয়ে ভারতীয় ঔদার্যের সূর্যরশ্মি প্রথম প্রবেশ করল তাঁদের পবিত্র মন্দিরে।

১৮। *ডুবোজাহাজে নেতাজী*, পৃঃ ১৭-১৯

১৯। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, *স্বামি-শিষ্য-সংবাদ* (পূর্ব কাণ্ড), দ্বাদশ বল্লী, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩২৮, পৃঃ ১০৯-১১১

২০। তদেব, পৃঃ ১০৯-১১০

২১। আবিদ হাসান, ভাষান্তর : শেখর বসু, *'আগে জানতাম না কোথায় যাচ্ছি', নেতাজীর সঙ্গে ডুবোজাহাজে* (আনন্দবাজার পত্রিকা রবিবাসরীয়, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩), পৃঃ ৯

২২। *নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা*, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা, পৃঃ ৩৯-৪০

২৩। 'আগে জানতাম না কোথায় যাচ্ছি', পৃঃ ৯

২৪। তদেব, পৃঃ ৯